ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 85-93
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.012

অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতা

প্রিয়াংকা ধর, গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত*
E mail: priyankadhar56@gmail.com, bishwa941984@gmail.com

Received: 03.09.2024; Accepted: 29.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

After ruling the Indian subcontinent for two centuries, British colonial rule ended with the price of partition, which brought about independence. The country became independent by splitting into two parts, which later evolved into three separate nations. The partition is a cursed event in the pages of history; viewed from one perspective, it was meant to liberate from colonial rule. However, a deeper and more nuanced examination of history reveals that the British were indeed responsible for the partition, as they desired division and control. Beyond the British, the personal and collective interests of some power-hungry and so-called native politicians also led to this division. During British rule, the rulers stoked communalism between the Hindu and Muslim communities to maintain their control over society and the nation. Communalism is fundamentally political, where religion is exploited for political gain. In politics, religion serves as a tool that helps sustain oppressive practices. Due to communalism, distrust, suspicion, bitterness, and animosity grew between people of different faiths, leading them to begin to hate each other. As a horrific result of this political maneuvering, India was divided based on the two-nation theory, resulting in the creation of two states. The partition brought a profound and transformative crisis into the life of Bengalis, from which they, especially those in Northeast India, have yet to find relief. New forms of crises seem to be increasing, with the most recent examples being the renewal of the National Register of Citizens and the formulation of the Citizenship Amendment Act in Assam.

While the experience of the tremendous crisis that arose in Bengali life due to partition reached extreme limits in real life, it is not as prominently reflected in Bengali literature. Nonetheless, fragments of the devastation of life and various crises resulting from partition are present in Bengali literature. The horrific history of partition and its festering wounds still linger deep within the hearts of the people of the Barak Valley and the Northeast. However, very few authors have addressed the context of partition in their writings.

Amitabh Dev Chowdhury, a writer from the Barak Valley, is no exception; he has inherited the memories and wounds of partition through his ancestors. Though he could not witness the partition firsthand, he perceives the dark consequences of partition through contemporary experiences. Since literature is merely an artistic representation of diverse human experiences, the issues of partition, the resulting refugee crisis, communal divides, struggles for rehabilitation, and the sorrows of Bengali life naturally find their way into his writings. The multifaceted picture of the existential crisis faced by these displaced people from fragmented Bengal frequently emerges in Amitabh's narratives. Additionally, his various stories and novels depict the social and political experiences of post-partition life in the Northeast. This section will discuss how the consequences of communalism in the aftermath of partition have manifested in a terrifying manner at the social level and how they have harmed society and people's lives, focusing on two selected stories by Amitabh Dev Chowdhury.

ভারতবর্ষে দীর্ঘ দুই শতাব্দী রাজত্ব করার পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে স্বাধীনতারূপী দেশভাগের মূল্যে। দেশ স্বাধীন হয় দুই টুকরোতে ভাগ হয়ে, পরে যা তিনটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দেশভাগ ইতিহাসের পাতায় এক অভিশপ্ত ঘটনা যা একদিক থেকে লক্ষ করলে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ঘটেছিল। কিন্তু ইতিহাসের পাতাকে গভীর ও সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে দেশভাগের জন্য ব্রিটিশ তো অবশ্যই দায়ী ছিল কারণ তারা চেয়েছিল ভাগ ও শাসন। কিন্তু ব্রিটিশ ছাড়াও কিছু ক্ষমতালোভী, কিছু তথাকথিত স্বদেশীয় রাজনৈতিকের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের পরিণাম ছিল এই বিভাজন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে থাকাকালীন শাসকেরা সমাজ ও দেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নামক রাজনীতির ইন্ধন জ্বালিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা বিষয়টি হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক। যেখানে রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করা হয়। রাজনীতির জন্য ধর্ম হচ্ছে এমন এক অন্যতম হাতিয়ার যা শোষণক্রিয়াকে সচল রাখতে সাহায্য করে। সাম্প্রদায়িকতার কারণে দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে এত অবিশ্বাস, সন্দেহ, তিক্ততা, বিরূপতার সৃষ্টি হল যে তারা পরস্পরকে ঘৃণা করতে শুরু করল। এই রাজনীতির ভয়াবহ ফলস্বরূপ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয় এবং সৃষ্টি হয় দুটি রাষ্ট্রের। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জনতা স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিল কিন্তু বিভাজনের বেদনা সেই আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে দেশ স্বাধীন হবে এটি নির্ধারিত হয়েছিল কিন্তু এটিকে এগিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে বিভাজন করে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।[১] সময় পাল্টে গেলেও সমাজ ও রাজনীতির রূপ আজও খুব বেশি পাল্টায়নি। আজও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক ভেদাভেদের রাজনীতি চলছে ক্ষমতার কূটিল নক্সায়। বরাক উপত্যকা তথা আসামের মানুষ আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বিংশ শতকের মধ্যভাগে ঘটে যাওয়া সেই দেশভাগ নামক ক্ষতকে বয়ে নিয়ে চলছে। দেশভাগ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক গভীর সঞ্চারী বিপদ নিয়ে এসেছিল, যে যন্ত্রণা থেকে বাঙালি বিশেষ করে উত্তরপূর্বের বাঙালি আজও নিষ্কৃতি পায়নি। নতুন নতুন রূপে সঙ্কট যেন বেড়েই চলেছে, যার সাম্প্রতিকতম নমুনা আসামে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়ন এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াতে লক্ষ করা যাচ্ছে।

দেশভাগের ফলে বাঙালি জীবনে যে মহাসংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তার অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনে চরম সীমানায় পৌঁছালেও বাংলা সাহিত্যে সেইভাবে দেখা যায় না। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর "ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থের 'ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ, বোবা বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভয়ঙ্কর 'গণমহাপ্রস্থান' বা একসোডাস কিংবা প্রব্রজিত মানুষের ক্যাম্পের জীবন বাংলা সাহিত্যে খুব অল্পই উঠে এসেছে।[২] তবুও দেশভাগের ফলে জীবনের বিপর্যয় ও নানামুখী সমস্যা সংকটের টুকরো ছবি বাংলা সাহিত্যে একেবারে কমও নেই। দেশভাগের মতো ভয়ংকর ইতিহাস ও তার দগদগে ঘা এখনও এই বরাক উপত্যকা তথা উত্তরপূর্বাঞ্চলের মানুষ অন্তরের গহনে বয়ে নিয়ে চলছে। তবুও খুবই কম সংখ্যক মানুষের লেখায় উঠে এসেছে দেশভাগের প্রেক্ষাপট। দেশভাগের পরিণাম সম্পর্কে বরাক উপত্যকার প্রত্যেকটি পরিবার অবগত, বেশিরভাগই প্রত্যক্ষভাবে ভুক্তভোগী। এই ভুক্তভোগী পরিবারগুলি দেশভাগের স্মৃতিকথা বহন করে চলেছে প্রন্মের পর প্রজন্ম ধরে। বরাক উপত্যকার লেখক অমিতাভ দেব চৌধুরী এর ব্যতিক্রম নন, দেশভাগের স্মৃতি ও ক্ষত লেখক তাঁর পূর্বপুরুষের সূত্রে পেয়েছেন। তিনি সচক্ষে দেশবিভাজনের সাক্ষী হতে না পারলেও দেশভাগের কালো পরিণতিকে বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পারছেন। যেহেতু সাহিত্য হল মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার একটি শিল্পিত রূপ মাত্র, সুতরাং তাঁর সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে দেশভাগ ও তার ফলস্বরূপ ঘটিত উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, পুনর্বাসনের সংগ্রাম, বাঙালি জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি সহজ নিয়মে ঢুকে পড়েছে। খণ্ড বাংলার এই নির্বাসিত মানুষের অস্তিত্ব-সংকটের বহুমাত্রিক ছবি অমিতাভর কথার ভুবনে ঘুরে ফিরে এসেছে। তাছাড়া লেখকের বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে উত্তরপূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে দেশভাগোত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার চিত্র রয়েছে। মূলত এই অংশে অমিতাভ দেব চৌধুরীর নির্বাচিত দুটি গল্পকে কেন্দ্র করে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতার ফলাফল বা পরিণাম সামাজিক স্তরে কতখানি ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে এবং সমাজ ও মানুষের জীবনকে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা নিম্নে আলোচ্য অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

অখণ্ড ভারতবর্ষকে যে রাজনীতির উপর ভিত্তি করে মূলত বিভাজিত করা হয়েছিল তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। গত শতকের গোড়া থেকেই যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজও আমাদের সমাজে ক্রিয়াশীল। অধুনাতন সময়েও ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ মানুষের রক্তের পিপাসু হয়ে উঠেছে। আজ সমাজে মনুষ্যত্ব থেকে ধর্মীয় পরিচয় বৃহৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশভাগ শুধু স্বপ্নহননের বৃত্তান্ত নয়, এটি আমাদের সত্তাহননেরও বৃত্তান্ত। এখনও দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিষময় পরিণাম হতে দেশভাগোত্তর সমাজ রক্ষা পায়নি। দেশবিভাজনের জন্য যে জঘন্য রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছিল তারই পরিণামের প্রেক্ষাপটে লেখা অমিতাভ দেব চৌধুরীর দুটি গল্প- 'জ্বর' এবং 'এপ্রিল ফুলগাছ ও সেই লোকটি'। এই গল্প দুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নমালার সঞ্চার ঘটায় – আমরা কেন আগে হিন্দু-মুসলমান হলাম? বাঙালি কেন হলাম না? ধর্মীয় পরিচয়ে কারো সত্তা বা জাতিসত্তা নির্ধারিত হয় না- এটাই ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক সত্য। এই সত্যকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ তথা এদেশীয় কিছু ক্ষমতা লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছে।

লেখক অমিতাভ দেব চৌধুরী তাঁর 'জ্বর' গল্পের প্রধান চরিত্রের কোনও নামকরণ করেননি। মূলত এই চরিত্রের আসল পরিচয় সে বাঙালি, আর বাঙালি জাতি অবিভাজ্য। সুতরাং, সম্ভবত এই কারণবশত লেখক গল্পে চরিত্রের নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা বোধ করেননি। কিন্তু আমাদের অধুনা পরিস্থিতি এইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা প্রতিটি মুহূর্ত বাঙালিকে হিন্দু-মুসলমান হিসাবে বিভাজিত করে থাকি। লেখকের এই

চরিত্র নির্মাণের অভিপ্রায় হয়ত আমাদের চিরাচরিত বিশ্বাস ও বুদ্ধির দিকে প্রশ্নের আঙুল তুলে ধরা এবং মননে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোক পৌঁছে দেওয়া। তাছাড়া গল্পের মুখ্য চরিত্রই এই গল্পের বক্তা। 'জ্বর' গল্পটি মূলত একটি মানুষের সত্তা বা অস্তিত্বকে নিয়ে সংঘাত ও সংঘর্ষের কাহিনি। কারণ মুখ্য চরিত্রটি পিতা মুসলমান এবং মা হিন্দু অর্থাৎ তিনি সমভাবে দুটি ধর্মকে তার সত্তায় বহন করছেন। কিন্তু মায়ের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার ফলস্বরূপ তার কথাবার্তা ও আচরণে মায়ের দিকের অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবুও প্রতিটি পদক্ষেপে তার কর্ণগোচর হয়েছে নানারকমের কটূক্তি- **"হিঁদু বন্ধুদের সঙ্গেই জীবনের অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছি। তবুও আজও আমাকে শুনতে হয় 'কাটু', 'বাঙাল', 'মোল্লা'।"**[৩] এই পংক্তিটিতে ফুটে উঠেছে গভীর খেদ ও বেদনার আভাস। ভিন্নধর্মে বিবাহ করার জন্য তার বাবাকেও অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আজ একবিংশ শতকেও হিন্দু-মুসলমান এর বিবাহ নিয়ে তুমুল বিবাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। বিত্ত বা ক্ষমতাশীল মানুষ ছাড়া এই বিবাহের পরিণাম হিসাবে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে প্রাণসংশয় থেকে ধরে সমস্ত জীবনের জন্য চরম দুর্ভোগ। বক্তার বাবা ধর্মীয় দিক হতে মুসলমান হলেও তিনি কখনো তার হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী স্ত্রীকে ধর্মের ব্যাপারে কোনোরকম জোর করেননি। সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে দু-দিকের পরিবার-পরিজন কিছুদিন তার মা-বাবাকে গ্রহণ করেনি। সেইসময় তারা একঘরে হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করলেও অন্তর থেকে কখনোই গ্রহণ করতে পারেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনার দৃষ্টান্তে – বক্তার বয়স যখন ৭/৮ বছর ছিল তখন তার দাদুর বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। সেই পুজোতে তিনি ও তার মা গিয়েছিলেন। তার মা-বাবার বিবাহের পর কয়েক বছর এই পারিবারিক দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানটি বন্ধ ছিল। এখানে আমরা দেখব পরিবারের মধ্যে সমাজের ভয় কাজ করেছে, সমাজ তাদের বহিষ্কার করে তাদেরকে একঘরে করে দেবে এই ভয় পরিবারের মনে তাড়না করেছে। ভিন্নধর্মে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য তার মা পুজোর আয়োজন থেকে দূরে সরে সরে থাকলেন কারণ তিনি সমাজের জন্য অচ্ছুত, অস্পৃশ্য। দুর্গাঠাকুরের শাড়ির প্রতি আকর্ষণ ও কৌতূহলবশত বক্তা সেই শাড়িকে স্পর্শ করে নেওয়ায় তৎক্ষণাৎ দাদু ফরমান জারি করলেন- **"এই শাড়ি ঠাকুরের কাজে লাগবে না। এটা কুটুকে দিয়ে দে। ও পরবে। আমি নবীনকে পাঠাচ্ছি। বাজার থেকে আরেকটা শাড়ি এক্ষুনি কিনে আনবে।"**[৪] সেইসময় দাদুর এইরূপ আচরণের কারণ নির্বোধ ছোট্ট বক্তা না বুঝতে পারলেও পরিবার পক্ষ থেকে এই অচ্ছুত ব্যবহার ও অপমানের জ্বালা তার মা সহ্য করতে পারেননি। এ এক অদ্ভুত অস্তিত্বসংকটের গল্প। ধর্ম যেখানে অস্তিত্বের নিয়ামক, সেখানে মানবিক পরিসর ঝাপসা হয়ে পড়ে। দুর্গার শাড়ি ছোঁয়ার নির্দোষ আচরণের জন্য বিব্রত মা বালকপুত্রকে প্রহার করেন। পৃথিবীর যেকোনো স্থানে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের উপর কোনোরকম অত্যাচার হতে দেখলে সমব্যথী কথকের মন দুঃখ-কষ্টে মর্মাহত হয়ে পড়ে। কেননা সে তো একই অঙ্গে হিন্দু আর মুসলমান। তবুও, সমাজ তার পরিচয় তৈরি করে দেয়। কথকের উপলব্ধি - **"আমি, আমরা, কাটুয়া আস্তে আস্তে বুঝে যাই, বুঝে নিতে হয় আমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। বাহিরের বন্ধু, ভেতরের শত্রু।"**[৫] পিতৃসূত্রে মুসলমান হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে, একদিন হস্টেলের টিভিতে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের ওয়ানডে ম্যাচে ইন্ডিয়ার হারি হারি অবস্থায় তাকে বিনা দোষে শুনতে হয়েছে- **"কী রে মিঞা, তোর হাল কী? জাত ভাইদের জন্য আনন্দ হচ্ছে? ওরা জিতে যাবে বলে? শালা কাটুয়া- বাঙাল!"**[৬] পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃসূত্রকে বিশেষত গুরুত্ব দিয়ে তাকে প্রতিক্ষণ অপদস্থ করেছে। চাকরিসূত্রে আসামের শিলচর শহরে যাওয়ার পর তার নতুন নামকরণ হয়েছিল 'বাঙাল'। তিনি আদ্যন্ত ঘটি, তার কেউই কখনো বাংলায় ছিলেন না তাই এইরূপ নামকরণের কারণ বুঝতে পারলেন না। মূলত আসামের স্থানীয় লোকেরা বাংলাদেশ থেকে আসা লোককে বাঙাল বলে সম্বোধন করে তা নয়,

বরং মুসলমানকে কটূক্তি করার ছলে বাঙাল শব্দের ব্যবহার করে থাকে। এই গল্পে আমরা দেখব কীভাবে সংখ্যাগুরুদের আধিপত্যে সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হয়ে থাকে।

লেখক অমিতাভ গল্পটিতে নানান সময়ের ঘটনাক্রম তুলে ধরেছেন- যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের (১৯৯১) পূর্বসময় ও তারও পূর্বঘটনাক্রম। তাছাড়া গল্পটির বর্তমান সময় কেন্দ্রিত আছে ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গাকে নিয়ে। এই দাঙ্গাটি হল আধুনিক ভারতে রাজনীতি পোষিত সাম্প্রদায়িকতার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। গুজরাত দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল ৭৯০ জন মুসলমান ও ২৫৪ জন হিন্দু (সরকারি তথ্যানুসারে) আর অন্যান্য উৎস থেকে জানা যায় মোট ১,৯২৬ থেকে ২,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিল এবং আহতের সংখ্যা ২,৫০০ চেয়েও অধিক।[৭] তাছাড়া বহু নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ধর্ষণের পাশাপাশি ব্যাপক লুটপাট ও সম্পদ ধ্বংসের ঘটনাও ঘটেছে। গল্পে আমরা দেখব মুখ্য চরিত্রের পিসেমশাই গুজরাতে খানদানি ব্যবসায়ী। কিন্তু ২০০২ সালে দাঙ্গার ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে তুমুল ঝড়, বক্তা বলেছেন- **"ওরা বেঁচে গিয়েছে। বলেছিল, ব্যবসাপত্রের এখন আর কিছুই নেই। দোকান টোকান সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। শুধু বাড়িটা কোনক্রমে টিকে আছে।"**[৮] এখানে আমরা দেখব কোন দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি হলে মানুষ একে অপরের প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। হিংসা-বিদ্বেষের আগুন মানুষের সমস্ত কিছুকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। যেকোনো দাঙ্গার একটি সাধারণ লক্ষণীয় বিষয় হল- মানুষের কাছে ধর্মীয় পরিচয় তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে এই পরিচয়ই মানুষকে কখনো রক্ষা করে আবার কখনো প্রাণনাশ করে। এইরূপ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে তার পিসে-পিসিরা গুজরাত ছেড়ে ঠিক কোথায় আশ্রয় নেবেন তা অনিশ্চিত। পিসি বাঙালি বলে তার তখনও দেশ বলে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার রয়েছিল, কিন্তু পিসেমশাইয়ের দেশ বলতে তো কিছুই থাকেনি। সাম্প্রদায়িকতার ফলে প্রাণ রক্ষার্থে তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে। তাছাড়া গুজরাতে দাঙ্গা প্রসঙ্গে অফিসে নানান আপত্তিজনক কথাবার্তা শুনার পর বক্তা যখন এইরূপ সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলতে বারণ করেন, তখন তার সহকর্মীদের থেকে শুনতে হয়েছিল- **"কি বে কাট্টু, তোর কোন জায়গায় গিয়ে লাগছে বে? তুই তো ভালই আছিস শালা, আমাদের মধ্যে মদে-মাংসে চামিয়ে আছিস। আমরাও তো শালা তোকে আমাদের নিজের লোক বলে ভাবি। এখন জাতভাইদের জন্য দরদ উথলে উঠছে- না?"**[৯] সাধারণত অনেকসময় বন্ধুরা ঠাট্টা-পরিহাস করে হাসির ছলে অনেক অপ্রাসঙ্গিক অপ্রীতিকর কথা বলে থাকে, যার অনেকসময় সেইরকম গভীর অর্থ থাকে না। কিন্তু একই বিষয়কে নিয়ে যদি প্রতিদিন হেনস্তার শিকার হতে হয় তখন সেই ছোট্ট অর্থহীন কথাটিও গভীর ইঙ্গিতের দ্বারা মনে এমন ক্ষত সৃষ্টি করে যা থেকে বেরনো যায় না। ঠিক সেইভাবেই পূর্বে এইসব কটূক্তি এড়িয়ে গেলেও সময়ের সাথে সাথে এখন এই কথাগুলোই তার গায়ে কোথাও একটা যেন কট করে বিঁধে যায় এবং মন-মানসিকতায় চরম আঘাত করতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকালীন গল্পকথক মধুমিতা নামক হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু মধুমিতা প্রেমের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে জানায় যে সমবয়সীদের মধ্যে শুধু বন্ধুত্ব হয়, প্রেম হয় না। মধুমিতা যে ভদ্রতার খাতিরে সমবয়সী শব্দটি ব্যবহার করেছিল তা বুঝতে বক্তার খুব বেশি অসুবিধে হয়নি। মধুমিতা আসলে বুঝাতে চেয়েছিল যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয় না। যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি তার মায়ের বারণ করা সত্ত্বেও তার এক সময়ের হিন্দু সহকর্মী কেয়া-র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। কিন্তু খুব বেশিদিন এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থায়িত্ব লাভ করেনি এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। গল্পে বক্তা সম্পর্কের বন্ধনকে এক অসাধারণ উপমার সহিত আমদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন এইরূপ- **"ভিড় কাটিয়ে, গাড়ি আর যানবাহনের উদ্যত থাবা ও হর্ন কাটিয়ে, মই কাঁধে, পৃথিবীর যাবতীয় ব্যালেন্স- সচেতনতার সূক্ষতা ও তত্ত্ব নিজেদের মেরুদণ্ড আর হৃদয়ে ধারণ করে, অবিরাম রৌদ্রের ভিতরে, সহাস্য অথচ গলদধর্ম, ছুটে চলেছে দুই সাইকেল-আরোহী ইলেট্রিশিয়ান। তাদের একের কাঁধে অপরের**

জীবন। একে প্যাডেল-ঘোরানো পায়ে অপরের মৃত্যু। .....এখনও যেকোনো সম্পর্ক বাহক দুজনের কাঁধের সেই অদৃশ্য মইটির নিবিড় অবস্থান- কতটা অবলীলায়, সযত্নে, কিংবা স্পর্শকাতরতায় তারা বহে নিয়ে যাচ্ছে ওই অনন্ত মইটিকে। একজনের সামান্যতম ভুলের পরিণতিতে উভয়ের পৃথিবী নিমেষে অন্ধকার লিপিমালা হয়ে যেতে পারে।"[১০] অর্থাৎ জীবনের পথ চলাকালীন যেকোনো সম্পর্ক নানান রকমের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে- ভালো-মন্দ সবকিছু মিশ্রণেই জীবনের সার্থকতা। তাছাড়া এখানে দু'জন ইলেকট্রিশিয়ান হচ্ছে সম্পর্কবাহক- তা যেকোনো কেউ হতে পারে নারীপুরুষ অথবা হিন্দু-মুসলমান। প্রত্যেকটি সম্পর্কের বাহক তাদের কাঁধের মধ্যে মই স্বরূপ নিবিড় বিশ্বাসের অবস্থানকে বয়ে নিয়ে চলে। যেকোনো বাহকের দ্বারা সংঘটিত ভুল উভয়ের জীবনে ঘনান্ধকার নিয়ে আসতে পারে।

তাছাড়া এখানে লক্ষণীয় বিষয় আলোচ্য গল্পে উল্লেখিত প্রত্যেকটি ঘটনাক্রমের শেষে জ্বর এর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই জ্বর এখানে এক গভীর ইশারা বা ইঙ্গিত বহন করে। জ্বর এলে তার সবসময় মনে হয় যেন কোনও এক আলাদা অস্তিত্ব তার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এই জ্বর হচ্ছে অসংখ্য বঞ্চনা, লাঞ্ছনা দ্বারা সৃষ্ট মানসিক ব্যাধি যা বর্তমানে একরকম শারীরিক ব্যাধিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এই জ্বর আসলে সমাজের প্রতি পোষে রাখা অসহায় ক্ষোভের প্রকাশ যা বহির্জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হতে না পেরে মানসিক পীড়ায় পরিবর্তিত হয়ে নিজের অন্তরের দ্বি-ধর্মীয় সত্তার সাথে প্রতিক্ষণ সংঘর্ষ করে চলছে, তাই হঠাৎ তার মনে হল কোথাও থেকে তীব্র দাঙ্গার শব্দস্বরূপ স্রোত ভেসে আসছে। শব্দটি যত তীব্র হতে লাগল তার জ্বরও তত বাড়তে লাগল। সেই সাথে মনের ভেতর প্রশ্নের ঢেউ উঠতে লাগল- **"শব্দটা, উফ, মাথা ছিঁড়ে ফেলছে যেন। সর্বনাশ ! এই চিৎকার তো উঠছে আমারই মধ্য থেকে। তবে কি আমার ভেতরেই দাঙ্গা লেগে গেছে? আমার যে টুকরোটা হিন্দু, তা মুসলমান অংশটার ওপর চড়াও হতে চাইছে? আমার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মুসলমান ঘুমিয়ে আছে, তা-কি এখন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠতে চাইছে?"**[১১] মানসিক পীড়নের জ্বালা তাকে তিলেতিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত অস্তিত্বকে নিয়ে তিনি মনের মধ্যে লড়াই করছেন। গল্পের অন্তিম পর্যায়ে তিনি আর্তনাদ করছেন, তার এই দ্বি-সত্তার দ্বন্দ্ব স্বরূপ মানসিক যন্ত্রণা থেকে তাকে উদ্ধার করার নিবেদন জানিয়েছেন। লেখক অমিতাভ দেব চৌধুরীর লেখা এই 'জ্বর' গল্পটি নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ পাঠ যা আমাদের চিরাচরিত ভাবনায় নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে এবং পুরনো চিন্তা-ধারণার পুনর্বিবেচনা করার জন্য আগ্রহী করে তোলে।

দেশভাগের পরবর্তী প্রভাব সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে- 'এপ্রিল ফুলগাছ ও সেই লোকটি'। গল্পটি সাংকেতিকধর্মী রচনা, যেখানে একটি এপ্রিল ফুলগাছের উল্লেখ আছে। এই এপ্রিল ফুলগাছ মূলত আমাদের চেতনার প্রতীক, নিঃস্বার্থ ভাবে কিছু করে ওঠার চেতনা। যা সময়ের বদলে মনুষ্য চেতনারও বদল ঘটেছে। লেখক রমজান আলিকে দিয়ে আমাদের চেতনার উপর প্রশ্ন তুলেছেন- ১৯৬১ সালে জনতা আর আজকালকার জনতার মধ্যে বিশাল ফারাক লক্ষ করা যায়। একষট্টির জনতার জোশ-রাগ-শোক একত্র হয়ে ভাষা রক্ষার দাবি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পরিণামের চিন্তা না করে। পূর্বের চেতনার সাথে বর্তমানের চেতনার তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই রমজান আলি বলেছিল- **"আপনার ভেতরে খুঁজুন এপ্রিল ফুলগাছ আর নেই। হলুদ ফুল আর ফোটে না। হলুদ আর লাল হয় না।"**[১২] আমরা গল্পের মুখ্য বিষয় লক্ষ করলে দেখব একষট্টির ভাষা আন্দোলন এবং সেটিকে কেন্দ্র করে জনতার চেতনা। রমজান আলি নামক এক মুসলমান লোক গত কয়েক বছর ধরে এপ্রিল মাসের শুরু থেকে ধরে উনিশ-বিশ-একুশ মে অবধি শিলচর শহরের এদিক-ওদিক এপ্রিল ফুলগাছের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এপ্রিল মাসে একদিন হঠাৎ একটি চায়ের দোকানে গল্পের কথকের সাথে সাক্ষাত ঘটে এপ্রিল

ফুলগাছ সন্ধানকারী রমজান আলির। এ সাক্ষাৎ অলীক, কেননা সেইসময় লেখক ছাড়া রমজান আলিকে অন্য কেউ অর্থাৎ দোকানদারও দেখতে পেল না। রমজান আলি তার সম্মুখে সংক্ষেপে তুলে ধরেছিল তার জীবনবৃত্তান্ত। ১৯৬১ সালে ২০শে মে শিলচরে ন'জন শহিদকে নিয়ে গোটা শহর জুড়ে যে ঐতিহাসিক মিছিল হয়েছিল, সেই মিছিলে সবার দেখাদেখি হাতে এপ্রিল ফুল নিয়ে রমজানও যোগদান করেছিল। গ্রাম-গঞ্জ চারিদিক থেকে শুরু হয়েছিল পদযাত্রা। রমজান খুবই সাধারণ লোক ছিল তাই সে বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছুই চিন্তা ভাবনা না করে বেরিয়ে পড়েছিল পদযাত্রায়। সেই যে তার মা-কে বলে বেড়িয়েছিল রমজান তারপর থেকে সে আর ফিরেনি।

১৯৬০ এর অক্টোবর মাসে শিলঙে আসাম বিধানসভার ভাষা বিল পেশ করা হয়েছিল। সেইসময় স্থির হয়েছিল সারা রাজ্যে অসমিয়া ভাষাই সরকারী ভাষা স্বীকৃতি পাবে। এটি সেই সময়কার ঘটনা যখন নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ সব আসামের অংশ- তখনও বিভাজন হয়নি। ওই সময় বাঙালিরা ক্ষেপে ওঠেছিল কারণ ১৯৪৭ এর বিভাজন বরাকের বাঙালিকে বাধ্য করেছিল তাদের পূর্ব-নিবাস ছেড়ে আসার জন্য। প্রাণরক্ষায় দায়ে বাঙালি বাস্তুচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। সর্বস্ব হারিয়ে বাঙালি শুধু তার ভাষার মধ্যে নিজেদের দেশ-ঘরবাড়ির পরিচয় জীবিত করে রেখেছিল। তাই সেইসময় কোনও বাঙালিই তার নিজের ভাষাকে ত্যাগ করতে সম্মত হয়নি। একষট্টিতে বাঙালি ভাষা রক্ষার জন্য প্রতিবাদী উদ্যম নিয়ে আন্দোলনের সূচনা করেছিল। সেইসময় লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আন্দোলনে যোগদানও করেছিল নিজের ভাষিক পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য – ভদ্রলোক থেকে ধরে বাজারি, মুটে, বাঙালি-হিন্দু, বাঙালি-মুসলমান, মণিপুরি, ডিমাসা- এমন কেউ নেই যে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেনি। প্রচুর মানুষজনের সমাবেশ ঘটেছিল। উনিশে মে- এর দুপুরবেলা হঠাৎ গুলি ছোঁড়া শুরু হয়েছিল। সেইদিন শিলচর শহরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্ম-বলিদান দিয়েছিল দশভাই চম্পা ও একটি পারুল বোন। বিশ মে শোকের ছায়ায় পুনরায় মিছিল বেড়িয়েছিল কারফিউ অমান্য করে। ওইদিন জনতার মধ্যস্থলে প্রচণ্ড রাগ ও ক্ষোভের অগ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বলছিল। জনতার আক্রোশ পুলিশের প্রতি মারমুখি হয়ে উঠেছিল। চারিদিকে উত্তেজনা ও এক বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতির সূচনা হয়। অবশেষে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বাঙালির এই ভাষিক পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য একষট্টিতে হিন্দু-মুসলমান থেকে ধরে সকল শ্রেণির লোকজন সম্মিলিত হয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অবিভাজ্য বাঙালি সত্তা দেশ ও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু গল্পে আমরা রমজান আলির কথোপকথনে বাস্তব জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করি- **"আপনারা ভাবেন মুসলমান আপনাদের দেশটাকে কেড়ে নিল। এই দেশটা কি মুসলমানেরও দেশ নয়? আমরা যারা দেশভাগের পর এ দেশটাতে থেকে গিয়েছিলাম, আমরা দেশটাকে ভালবাসি বলেই তো থেকেছিলাম। ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পর ওদেশে যাইনি। পাকিস্তানে যাইনি। মুসলিম কান্ট্রিতে যাইনি। আপনারা মাঝে মাঝেই আমাদের সে ভালোবাসাকে অবিশ্বাস করেছেন। সন্দেহ করেছেন। এখনও করেন। অথচ পাকিস্তানে না গিয়ে এই দেশে থেকে যাওয়ার মানে যে দেশটাকে ভালবাসা তা আপনারা এখনও বুঝতে চান না। এই দেশটা তো আমারও দেশ। আমাদেরও দেশ। দেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাষাও আমার। যে ভাষায় কথা বলি সেই ভাষাটাকে আমিও ভালবাসি। আমরা ও ভালবাসি। অথচ আপনারা সবসময় এই ভালবাসাটা বুঝতে চান না। সন্দেহ করেন। বলেন, মুসলমানের দেশ তো তার ধর্মে। কেন বাবা? মুসলমানের দেশ ভাষায় নয়? ভাষায় নেই?"**[১৩] আজও আমাদের এই ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে অনেককেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এর কারণ হিসাবে বলতে পারি কিছু হীনমনস্ক লোক নিজ স্বার্থে সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার রঙ লাগিয়ে দেয়। যার জন্য এই হিন্দু-প্রধান দেশের অধিকাংশ জনতা

মুসলমানদের অবিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা এটি বুঝতে চাই না যে এই দেশের মুসলমান সম্প্রদায় যদি এই দেশটিকে ভালো নাই বাসিত তাহলে তারা দেশভাগের সময় পাকিস্তানে চলে যেতে পারত। কিন্তু তারা যায়নি, কারণ এই দেশটিকে তারাও সমভাবে ভালবাসে। দেশ ও দেশের ভাষাকে ভালবাসে বলেই তারা থেকে গিয়েছিল। এই সহজ সত্যকে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনা। দুটি জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা সম্পর্কের যে দূরত্ব আছে তা সময়ের সাথে অনেক বেড়ে গেছে তাই আজও এই দ্বি-সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে প্রত্যুষ হয়নি। অনেক আগেই 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'হিন্দু-মুসলমান' প্রসঙ্গে লিখতে দেখি - **"ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?"**[১৪] এই গল্পে দেশভাগোত্তর পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতিসত্তার দ্বিধাবিভাজনের ধারাবাহিকতাকে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যুক্ত করে উপস্থাপিত করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে একধরণের হীনমন্যতার প্রতীক। কিছু সংখ্যক স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী মানুষ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের চক্রে যে কোনও ঘটনাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সাধারণ মানুষের মানসিকতায় এমন এক দৃঢ় হীনমন্যতার দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলেছে যে বর্তমান সমাজে মানুষের প্রাণের চেয়ে তার ধর্মীয় পরিচয় বৃহৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার দাবানলে পড়ে আজও অনেক মানুষ অস্তিত্বের লড়াই করছে। এই অস্তিত্বের লড়াই ও সংকট এইভাবেই চলবে যতক্ষণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করে মানুষ মানবিকতাকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিচ্ছে। এভাবেই অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পের ভুবনে দেশভাগ ও উত্তরকালে পূর্বোত্তর ভারতের বাঙালি অস্তিত্বের সীমাহীন দহনকথার ধারাবাহিকতা বয়ানের কেন্দ্রীয় আধেয় হয়ে উঠেছে।

উল্লেখসূত্র:

১। Ghose, Sankar (১৯৯৩)। *Jawaharlal Nehru : a biography* (1. publ. সংস্করণ)। New Delhi [u.a.]: Allied Publ.। পৃষ্ঠা 151। *আইএসবিএন* *9788170233695*।

২। সিকদার, অশ্রুকুমার, 'ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৬

৩। দেব চৌধুরী, অমিতাভ, তিন ঘন্টার জীবন কাহিনি, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, ২০১৩, পৃ - ১০

৪। তদেব, পৃ - ১১

৫। তদেব, পৃ - ১২

৬। তদেব, পৃ - ১২

৭। Retrieve from on 20.08.2024 at 8 pm https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%A8_%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE#:~:text=%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%A8%20%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9F%20%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%20%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%20%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0

%A6%AE,%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9F%20%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%20%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%93%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A5%A4&text=%E0%A6%8F%E0%A6%87%20%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%20%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%20%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE,%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82%20%E0%A7%A8%2C%E0%A7%AB%E0%A7%A6%E0%A7%A6%20%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A5%A4

৮। দেব চৌধুরী, অমিতাভ, তিন ঘন্টার জীবন কাহিনি, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, ২০১৩, পৃ- ১০

৯। তদেব, পৃ - ১০

১০। তদেব, পৃ - ১৬-১৭

১১। তদেব, পৃ - ১৯

১২। দেব চৌধুরী, অমিতাভ, 'র‍্যাডক্লিফ সাহেবের হাত', স্রোত প্রকাশনা, ত্রিপুরা, ২০১৯, পৃ- ৫১

১৩। তদেব, পৃ - ৫০

১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৪৪, পৃ- ৩১৩